জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ছাত্রশক্তির এক অমর অভ্যুদয়

ম.শেফায়েত হোসেন

বাংলাদেশ ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে থাকবে। এটি কেবল একটি সরকার পরিবর্তন নয়, বরং তরুণ প্রজন্মের সম্মিলিত শক্তি, অদম্য সাহস এবং আপসহীন প্রতিবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন কীভাবে একটি সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশের ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলো, সেই গল্পে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

তরুণদের ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিল করা হলেও, ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের রায়ে তা আবার পুনর্বহাল হয়। এই পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। "বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন" ব্যানারে শুরু হয় নতুন লড়াই। ২ জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবাগ কেন্দ্রিক মিছিল-সমাবেশ ধীরে ধীরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীরা, যাদের হৃদয়ে ছিল বৈষম্যমুক্ত এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

আন্দোলনের প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তারা কেবল সাধারণ শিক্ষার্থীদের মুখপাত্র ছিলেন না, বরং ছিলেন আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণকারী, সংগঠক এবং অনুপ্রেরণার উৎস। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো ছিল তাদের প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম, যেখানে তারা দ্রুত বার্তা ছড়িয়ে দিতেন, কর্মসূচি ঘোষণা করতেন এবং অন্যদের আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসাহিত করতেন। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, সুশৃঙ্খল মিছিল এবং স্লোগানের মাধ্যমে তারা সরকারের কাছে তাদের দাবি তুলে ধরেন।

আন্দোলন যখন ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি মন্তব্য আগুনে ঘি ঢালে। তিনি আন্দোলনকারীদের 'রাজাকারের নাতি-পুতি' বলে অভিহিত করলে দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এই মন্তব্য তরুণদের আরও বেশি ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তাদের মধ্যে এক নতুন চেতনার জন্ম দেয়। ‘তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার। কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার’—এই স্লোগানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

এই মন্তব্যের পর, আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এবং তথ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাতসহ আরও অনেক নেতা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিতে থাকেন। ওবায়দুল কাদেরের মন্তব্যের পর, সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ২০১৮ সালের মতো দেশীয় অস্ত্র নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়, এমনকি নারী শিক্ষার্থীদেরও লাঞ্ছিত করা হয়। কিন্তু এবার শিক্ষার্থীরা পিছপা হয়নি। তারা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এই ঘটনাটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক নতুন আত্মবিশ্বাস তৈরি করে এবং দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়কে "ছাত্রলীগ মুক্ত" ঘোষণা করা হয়। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী নেতাদের কৌশলগত বিচক্ষণতা এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। ১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'রাজাকার' মন্তব্যের জের ধরে রাতে শিক্ষার্থীরা ব্যাপক বিক্ষোভ করে। ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগসহ সরকার সমর্থকরা হামলা চালায়। ১৬ জুলাই সারা দেশে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় এবং আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ সরকার সমর্থকরা। এতে নিহতের ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ড আন্দোলনকারীদের আরও সংকল্পবদ্ধ করে তোলে। শিক্ষার্থী নেতারা এই শহিদদের রক্তের শপথ নিয়ে আন্দোলনের গতি বাড়ানোর আহ্বান জানান।

১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে ছাত্রলীগ নেতাদের বের করে দিয়ে কক্ষ ভাঙচুর করা হয়। ওই দিন রাতে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা সরকারের দমন-পীড়নের একটি অংশ ছিল। তবে, এই ইন্টারনেট বন্ধ করা আন্দোলনকারীদের দমাতে পারেনি, বরং তারা বিকল্প উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮ জুলাই দেশব্যাপী প্রতিরোধ, সহিংসতা, সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনা ঘটে। ঢাকাসহ সারা দেশ প্রায় অচল হয়ে পড়ে। রাজধানীর বাইরে দেশের প্রায় প্রতিটি জেলা উপজেলায় দিনভর বিক্ষোভ, অবরোধ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, পুলিশের হামলা-গুলি ও সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় নিহত ও আহত হন অনেকেই। সারা দেশে বিজিবি মোতায়েন করা হয় এবং রাতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থী নেতারা এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের সাহস জুগিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৌশল পরিবর্তন করেছেন। ইন্টারনেটের অভাবে তারা মুখোমুখি যোগাযোগের ওপর জোর দেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করে আন্দোলনের বিস্তার ঘটান।

১৯ জুলাই কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। আন্দোলনকারীরা ৯ দফা দাবি না মানা পর্যন্ত 'শাটডাউন' চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। এই কর্মসূচি সরকারের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে।

২০ জুলাই শনিবার দেশজুড়ে কারফিউ জারি হয় করা হয়। সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কারফিউ চলবে। এই সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই গ্রেপ্তার ও কারফিউ আন্দোলনকারীদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক সৃষ্টি করলেও, শিক্ষার্থী নেতাদের দৃঢ়তা এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি তাদের অবিচল আস্থা আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখে। তারা গোপনে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখেন এবং আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন।

২১ জুলাই সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পুনর্বহাল-সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় সামগ্রিকভাবে বাতিল (রদ ও রহিত) করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় প্রদান করা হয়। রায়ে মেধাভিত্তিক ৯৩ শতাংশ, মুক্তিযোদ্ধা ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ১ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১ শতাংশ কোটা নির্ধারণ করা হয়। এই রায়টি ছিল আন্দোলনকারীদের একটি বড়ো বিজয়, তবে শিক্ষার্থী নেতারা এই জয়ে সন্তুষ্ট না থেকে আরও চার দফা দাবি পূরণের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেন। তাদের লক্ষ্য ছিল কেবল কোটা সংস্কার নয়, বরং সরকারের পদত্যাগ।

২২ জুলাই কোটাপ্রথা সংস্কার করে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি করা প্রজ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দেন। রাতে সীমিত আকারে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা চালু হয়। ২৪ থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় সংঘর্ষের ঘটনা চলতে থাকে। কোটা আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার ও রিফাত রশীদের খোঁজ পাওয়া যায়। ২৫ ও ২৬ জুলাই চিকিৎসাধীন আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়।

এই সময় সরকার দমন-পীড়ন আরও বাড়িয়ে দেয়। ২৬ জুলাই সারা দেশে ‘ব্লক রেইড’ চলে এবং অন্তত ৫৫৫টি মামলায় ছয় হাজার ২৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় । ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার, সারজিস আলম, হাসনাত আবদুল্লাহ এবং নুসরাত তাবাসসুমসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৬ সমন্বয়ককে হেফাজতে নেয়।

ডিবির হেফাজতে থাকা ছয়জন সমন্বয়ক এক ভিডিও বার্তায় সব কর্মসূচি প্রত্যাহারের কথা বললেও, অন্য তিন সমন্বয়ক মাহিন সরকার, আব্দুল কাদের ও আব্দুল হান্নান মাসুদ জানান যে, অস্ত্রের মুখে তাদের এই ভিডিও বিবৃতি নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা শিক্ষার্থী নেতাদের মধ্যে এক ধরনের বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করলেও, আন্দোলনের মূল স্রোতকে দমাতে পারেনি।

৩০ জুলাই হত্যার বিচার চেয়ে মুখে লাল কাপড় বেঁধে মিছিল হয়। জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতিতে স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান জানানো হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে অনেকেই প্রোফাইল লাল রঙের ফ্রেমে রাঙিয়ে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এদিন ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা আসে। ৩১ জুলাই এই কর্মসূচির পর ‘রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস’ নামে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

১ আগস্ট ডিবির হেফাজতে থাকা ছয় সমন্বয়ককে ছেড়ে দেওয়া হয়। ৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি আদায়ে ঘোষণা দেয়। ৪ আগস্ট ঢাকায় লং-মার্চের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই লং-মার্চ ছিল আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়, যেখানে শিক্ষার্থী নেতারা দেশের সাধারণ মানুষকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

৫ আগস্ট সোমবার সকালেও রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে ছাত্র-জনতার সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংঘর্ষ চলে। গুলিতে সেদিনও অনেক শিক্ষার্থী নিহত হন। তবে দুপুর ১২টার দিকে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জাতির উদ্দেশে ভাষণের ঘোষণা দেন। তখনই রাজধানীর বুকে ছাত্র-জনতার ঢল নামে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা ‘মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া লাখো মানুষের সমাবেশ বেলা আড়াইটার দিকে গণভবনের দিকে যাত্রা করে।

সেনাপ্রধানের ভাষণের পরই উচ্ছ্বসিত ছাত্র-জনতার মিছিলে স্লোগান ওঠে, ‘কী হয়েছে কী হয়েছে, শেখ হাসিনা পালাইছে’। ৩৬ দিন আগে শুরু হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলন ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে, যার জন্য শেষদিন পর্যন্ত সময়কে ‘৩৬ জুলাই’ বলে আখ্যা দিয়েছে ছাত্র-জনতা। এই দিনটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন সূর্যোদয়ের দিন, যেখানে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন একটি গণআন্দোলন দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটায়।

৬ আগস্ট সরকারহীন, পুলিশহীন দেশে কিছুটা অরাজকতা দেখা দেয়। তবে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের

নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তাব মেনে নেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। সংসদ বিলুপ্ত করা হয়। ৭ আগস্ট পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল হয় এবং মো. ময়নুল ইসলামকে আইজিপি নিয়োগ করা হয়। ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকায় ফিরে আসেন এবং রাতে বঙ্গভবনে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন। তার সাথে আরও ১৪ জন উপদেষ্টা শপথ নেন।

এই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে শিক্ষার্থী নেতাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা ড. ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে প্রস্তাব করেন এবং তার নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ ও জনগণের আকাঙ্ক্ষাপূরণকারী সরকার গঠনের পক্ষে জনমত তৈরি করেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে যে, তরুণ প্রজন্মের ঐক্যবদ্ধ শক্তি কতটা শক্তিশালী হতে পারে। এই বিপ্লবে শিক্ষার্থী নেতারা কেবল আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেননি, বরং তারা দেখিয়েছেন কীভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দৃঢ়তা, সাহস এবং কৌশলের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। তারা রাজনৈতিক নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হত্যার হুমকি উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত নিজেদের দাবি আদায় করেছেন। এই বিজয় বাংলাদেশের ইতিহাসে শিক্ষার্থীদের জন্য এক নতুন পথ উন্মোচন করেছে, যেখানে তারা দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। জুলাই আন্দোলন কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, এটি বাংলাদেশের প্রতিটি তরুণ-তরুণীর জন্য একটি অনুপ্রেরণা, যারা বৈষম্যমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখে। এই বিপ্লব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, তরুণরাই পারে একটি জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে।

#

লেখক: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ অফিসার

পিআইডি ফিচার